পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৪—১৮৯৯

সূচীপত্র

- পালামৌ সম্পর্কে

- প্রথম প্রবন্ধ
- দ্বিতীয় প্রবন্ধ
- তৃতীয় প্রবন্ধ
- চতুর্থ প্রবন্ধ
- পঞ্চম প্রবন্ধ
- ষষ্ঠ প্রবন্ধ

পালামৌ সম্পর্কে

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- এর জন্ম বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলাধীন নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে।তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হুগলীর ডেপুটি কালেক্টর, মাতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুল ও হুগলী কলেজে পড়াশুনা করেন। *বর্ধমান কমিশনার অফিসে-* এ কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তিতে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

বাংলা সন ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- এর মধ্যমানুজ) প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এছাড়া ১২৮০ থেকে ১২৮২ বাংলা সনে 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৯৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- এর মৃত্যু ঘটে।

পালামৌ প্রথম প্রকাশিত হয় *বঙ্গদর্শন-* এ, 'প্রমথনাথ বসু' লেখক নাম নিয়ে। এছাড়া তিনি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধসহ বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। *কণ্ঠমালা* (১৮৭৭) , *মাধবীলতা* (১৮৮৪) তাঁর দুটি উপন্যাস; *জালপ্রতাপ চাঁদ* (১৮৮৩) তাঁর ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। তাঁর দুটি গল্পের নাম *রামেশ্বরের অদৃষ্ট* (১৮৭৭) ও *দামিনী*। এছাড়া ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণামূলক ইংরেজি গ্রন্থ *Bengal Ryots: Their Rights and Liabilities*। বলা হয় এই গ্রন্থ পাঠ করে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁকে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ দেন। বিহারের পালামৌ ছিলো ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হিসেবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। দু'বছরের মাথায় তিনি পালামৌ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানকার স্মৃতি নিয়ে রচনাসমূহই পরে *পালামৌ* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলা ১৩০১ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পালামৌ নামে একটি সমালোচনা প্রবন্ধে *পালামৌ* গ্রন্থ ও এর প্রণেতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মূল্যায়ন করেন। নিচে সে প্রবন্ধটি দেয়া হলো:

পালামৌ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পালামৌ

কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কী একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্বসাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সে-স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন

করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিনী নহে।

একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিবেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান, প্রমাণবিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে- একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।

'পালামৌ' সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্নসহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না। বঙ্কিমবাবুর রচনায় যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ আছে সেইখানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সঞ্জীববাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য—তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না। তিনি যেন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছেন, 'দেখো বাপু, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা দিতেছি তাহাই গ্রহণ করো, বেশি মাত্রায় কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না। '

'পালামৌ'- ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে—কিন্তু তবু তাহার মধ্যেও নির্বাচন এবং পরিমাণ সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে-

সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে, অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝর্ণা যখন চলে তখন যে পাথরগুলোকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘন - যোগ্য নহে' তাহাকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যায়। সঞ্জীববাবুর এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পাশ কাটাইবার যোগ্য, যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন, 'এখন এ- সকল কচ্‌কচি যাক।' কিন্তু এই- সকল কচ্‌ কচিগুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে। যেজন্য সঞ্জীবের প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই আমরা উপরে তাহার কারণ ও উদাহরণ দেখাইতেছিলাম, আবার যেজন্য সঞ্জীবের প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের যোগ্য তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।

'পালামৌ'- ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে- একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্ধক্যের লক্ষণ আছে—আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া- আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে, এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সর্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। 'পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নতূন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন

সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোলরমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক চেতন হউক ছোটো হউক বড়ো হউক, সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে। লেখক যখন যাত্রা-আরম্ভকালে গাড়ি করিয়া বরাকর নদী পার হইতেছেন এমন সময় কুলিদের বালকবালিকারা তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া 'সাহেব একটি পয়সা' 'সাহেব একটি পয়সা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; লেখক বলিতেছেন—

'এই সময় একটি দুই-বৎসর-বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল; অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তুমুল কলহ বাধিল।'

সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু তাহার উদ্দেশ্যবোধহীন অনুকরণবৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে-একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয়; সেই একটি উলটা-হাতপাতা ঊর্ধ্বমুখ অজ্ঞান লোভহীন শিশু-ভিক্ষুকের চিত্রটি সমস্ত শিশুজাতির প্রতি আমাদের মনের একটি মধুর রস আকর্ষণ করিয়া আনে।

দৃশ্যটি নূতন অসামান্য বলিয়া নহে, পরন্তু পুরাতন এবং সামান্য বলিয়াই আমাদের হৃদয়কে এরূপ বিচলিত করে। শিশুদের মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ইহারই অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেইগুলি বিস্মৃতভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র

সেই-সকল অপরিস্ফুট স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীববাবু তাহাই দেখিতেন—ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি, সঞ্জীববাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোনো আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্বে যে ঘটনাটি উদ্‌ধৃত করিয়াছি তাহা নূতন লক্ষ্যগোচর বিষয় নহে, তাহার মধ্যে কোনো নূতন চিন্তা বা পর্যবেক্ষণ করিবার কোনো নূতন প্রণালী নাই, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত সাহিত্যের অঙ্গ। গ্রন্থ হইতে আর-এক অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন, একদিন পাহাড়ের মূলদেশে দাঁড়াইয়া চিৎকার-শব্দে একটা পোষা কুকুরকে ডাকিবামাত্র 'পশ্চাতে সেই চীৎকার আশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্বদীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোনো-একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ-কন্‌ডক্‌টার।'

ইহা বিজ্ঞান, সম্ভবত ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোনো রসের অবতারণা করে না—আমাদের হৃদয়ে মধ্যে যে-একটি সাহিত্য-কন্‌ডক্‌টর আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না। ইহার পূর্বোদ্ধৃত ঘটনাটি অবিসংবাদিত ও পুরাতন, কিন্তু তাহার বর্ণনা আমাদের হৃদয়ের সাহিত্যস্তরে কম্পিত হইতে থাকে।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মতের সপক্ষে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেটি আমরা মূল গ্রন্থ হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিতে

ইচ্ছা করি।

'নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখনো ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোনো গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধুর মন মাতিয়া উঠে জল আনিতে যাইবে। জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে হইবে।' জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিণী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রঙ ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রঙ-ফেরা দেখিতে যাইতাম। '

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—

'জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয়জন লক্ষ্য করে?'

আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয়তো নাও দেখিতে পারে। কূলবধূরা জল ফেলিয়াও জল আনিতে যায়, সাধারণের স্থূলদৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না। বাংলাদেশে অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া-নামক সর্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনার সৌন্দর্যকিরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্ত বর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের পরম লাভ। সম্ভবত, সত্যের হিসাব হইতে দেখিতে গেলে অনেক মেয়ে

ঘাটে সখীমণ্ডলীর নিকট গল্প শুনিতে বা কুৎসা রটনা করিতে যায়, হয়তো সমস্ত দিন গৃহকার্যের পর ঘরের বাহিরে জল আনিতে যাওয়াতে তাহারা একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া সুখ পায়, অনেকেই হয়তো নিতান্তই কেবল একটা অভ্যাসপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হয় মাত্র, কিন্তু সেই-সকল মনস্তত্ত্বের মীমাংসাকে আমরা এ স্থলে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। অপরাহ্নে জল আনিতে যাইবার যতগুলি কারণ সম্ভব হইতে পারে তন্মধ্যে সব চেয়ে যেটি সুন্দর সঞ্জীব সেইটি আরোপ করিবামাত্র অপরাহ্নের ছায়ালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুলবধুর জল আনার দৃশ্যটি বড়োই মনোহর হইয়া উঠে; এবং যে মেয়েটি জল আনিতে যাইতে পারিল না বলিয়া একা বসিয়া শূন্যমনে দেখিতে থাকে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর এবং আকাশের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে, তাহার বিষণ্ন মুখের উপর সায়াহ্নের ম্লান স্বর্ণচ্ছায়া পতিত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণতলে একটি অপরূপ সুন্দর মূর্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই মেয়েটিকে যে সঞ্জীব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমরা লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সম্ভবপররূপে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি না, এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব বাংলাদেশে সাধারণত সত্য কি না এবং সেই সত্যটি সঞ্জীবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। আমরা কেবল অনুভব করি ছবিটি সুন্দর বটে এবং অসম্ভবও নহে।

সঞ্জীববাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন—

‘বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যেপ্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ-আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেইপ্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী, কিন্তু বৃক্ষপল্লব নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। সুতরাং রূপ-এক, তবে পাত্রভেদ।’

সঞ্জীববাবুর এই মতটি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন—

'সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভালো করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভালো করিয়া বুঝা যায় না, ভালো করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।'

সমালোচকের এ কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। কোনো-একটি বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব অবলম্বন না করিলে সঞ্জীবের রচনার সৌন্দর্য বুঝা যায় না এ কথা যদি সত্য হইত তবে তাঁহার রচনা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হইতে না। নদ-নদীতেও সৌন্দর্য আছে, পুষ্পে নক্ষত্রেও সৌন্দর্য আছে, মনুষ্যে পশুপক্ষীতেও সৌন্দর্য আছে, এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম—সেই সৌন্দর্য ভূতের মতো বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্মবশত আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয় সে-সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্যসম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন তাহার প্রিয়মুখকে চাঁদমুখ বলে তখন সে কোনো বিশেষ তত্ত্ব না পড়িয়াও স্বীকার করে যে যদি চাঁদ এবং তাহার প্রিয়জন বস্তুত সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তথাপি চাঁদের দর্শন হইতে সে যে-জাতীয় সুখ অনুভব করে তাহার প্রিয়মুখ হইতেও ঠিক সেই-জাতীয় সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের মতভেদ কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম; তাহার কারণ এই যে, এই উপায়ে পাঠকগণ অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন আমরা সাহিত্যকে কী নজরে দেখিয়া থাকি। এবং ইহাও বুঝিবেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে সহজ এবং সর্বজনগম্য আজকালকার সমালোচন-প্রণালীতে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পুরাতনকে একটা নূতন ঘরগড়া আকার দিয়া পাঠকের নিকট ধরিবার চেষ্টা করা হয়। ভালো কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না,

সুন্দর হয় না, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হইয়া উঠে।

গ্রন্থকার কোল-যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি।—

'এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে। হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত-ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড়ো চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুকধুকি চন্দ্রকিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওঠে হাসি। সকলেরই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।'

"সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।"

এই বর্ণনাটি সুন্দর, ইহা ছাড়া আর কী বলিবার আছে? এবং ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই বা কী হইতে পারে? নৃত্যের পূর্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনাশক্তির প্রভাবে হয়, কোনো বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা

হয় না। 'যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল' এ কথা বলিলে ত্বরিত আমাদের মনে একটা ভাবের উদয় হয়; যে কথাটা সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ঐ উপমা-দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোল-রমণীদের সর্বাঙ্গে একটা উদ্দাম উৎসাহচাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম, একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল—যদি আমাদের দিব্যকর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কলকোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্যবাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রেই যৌবনসন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই-যে একটা হিল্লোল ইহা এমন সূক্ষ্ম, ইহার এতটা কেবল আমাদের অনুমানবোধ্য এবং ভাবগম্য যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে "কোলাহলে'র উপমা অবলম্বন করিতে হয়, এতদ্‌ব্যতীত ইহার মধ্যে আর-কোনো গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি এই উপমা-দ্বারা লেখকের মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোনো সার্থকতা নাই, তবে ইহা প্রলাপোক্তি মাত্র।

বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বলিয়াছেন; সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাঁহাদের কোনো বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু এরূপ বিসদৃশ উপমাপ্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ-বায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার সেই সৌন্দর্যভঙ্গি আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠেন; আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কী-একট বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এইজন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত

রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে-একটি অনির্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কোনো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না; অতএব দেখা যাইতেছে, অদ্য সৌন্দর্যরাজ্য সঞ্জীববাবু তাঁহার নিজের রচিত একটা নূতন গলি কাটেন নাই, সমুদয় ভাবুক ও কবিবর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।

সঞ্জীব একটি যুবতীর বর্ণনার মধ্যে বলিয়াছেন—

'তাঁহার যুগ্ম ভ্রু দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি ঊর্ধ্বে নীল আকাশে কোনো বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।'

এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড়ো একটি আনন্দের উদয় হয়; কেবলমাত্র উপমাসাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্যের সহিত আর-কতকগুলি সৌন্দর্য জড়িত হইয়া যায়—সে একটা ইন্দ্রজালের মতো; ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে, অপরাহ্নের অতিদূর নির্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থগিতগতি পাখিটাকে দেখিতেছি না, যুবতীর শুভ্রসুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি জোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। জানি না, কেমন করিয়া কী মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূযুগল দেখিতে স্থিরদৃষ্টিকে বহু উচ্চে বহু দূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমার হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে—কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—

'প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ

বুজিয়া আছে; মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। ’

আহারপরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ঐ-যে মুখের সামনে একটি থাবা উলটাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর-কিছুতে হইতে পারিত না। সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতুহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

পৌষ ১৩০১

প্রথম প্রবন্ধ

বহুকাল হইলো আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই- এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে-চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালোবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোনো প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ যাওয়া আমার একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সে- স্থান কোনদিকে, কতদূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হবে এই বিবেচনায় ইনল্যান্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির (Inland Transit Company) ডাকগাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানিগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। নদী

অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাশি একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাশি তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কী অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে, আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক- একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমত সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা। " এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি। " একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরিবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ তুমি সাহেব। " আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কী?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী। " সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না তুমি সাহেব। " তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ি চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সাথে তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পাড়ে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই- একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য কী? বাল্যকালে পাহাড়- পর্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষত একবার এক বৈরাগী আখড়ায় চূনকাম- করা এক গিরিগোবর্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক- কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি- পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক- একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এইজন্য ফণাটি কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রীর গুণ নহে। বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কালীয়দমনের কালীয়, কাজেই যে পর্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা- যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য কী? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকট

পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিত পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ-কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না- শুনিয়া আমি পর্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমতো সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষনাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ি লইয়া

যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনো চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেননা বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পড়ায়; কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনার পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা। যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী- পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রম- পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মেজিস্ট্রেটির দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ি প্রবেশ করিলে তাহা কোনো ধনবান ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারাণ্ডায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই

বাটীর কর্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধহয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধহয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেননা তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্মের বড় বিরোধী! তদ্ভিন্ন আহারের আর কোনো দোষ ছিল না সঘৃত আতপান্ন, আর দেবীদুর্লভ ছাগমাংস, এই দুই- ই নির্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না, এ- বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের এক বৃদ্ধরাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই- এক দিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য, সকলের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন জোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দু চূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা ' পলাণ্ডু! ' এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালী পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোনো ফসল হয় না।

রাজার এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না, তাহা পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষত যে- সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন বোধহয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর- একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর- একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ব মর্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনোরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে 'কলাকাঁদির হিসাব' দেখিয়া বরং আরো চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ- সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প। 'কলাকাঁদির ফর্দ' সম্বন্ধে বালকদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন এক চাকর লোভ সম্বরণ করিতে না-পারিয়া দুইটি সুপক্ব রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ 'কাছারি' হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যেস্থান

হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে 'কলাকাঁদি' সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনো আমার মনে পুনঃপুন আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্বে কাহারও বাটীতেও পাওয়া যাইত না। লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে ' তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।" এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া। আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া একপ্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি। এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্বে আর কোনো উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক- সম্মুখে বালকেরা যে- টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোক যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষে

আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকের চক্ষু দুর্বল হইবার সম্ভাবনা; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে 'চালশা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবরা সর্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালীরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন। যে কুঠিতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠি সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠিটি যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের ওপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায় তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন তিনি বলিতে পারেন যে যদি এ- কথা সত্য হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীর মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা এ- কথা লইয়া কোনো তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই সেইমতো শিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তাঁহার মন, 'কুঠি'র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠির ভাড়ায় যে- ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে সে- ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে তাহা হইলে কী বুঝা কর্তব্য?

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই- চারিদিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেক জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না। এবার ইচ্ছা রহিল মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই- একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোনো একজন মিলিটারি সাহেব 'পেরেড বৃত্তান্ত', 'ব্যান্ডের' বাদ্যচর্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম পালামৌ প্রবল শহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কী অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা 'কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারকৃত' পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশ্রান্তি সংবাহক ভাটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ- কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি তো সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি- পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পালকি হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভালো চেনা গেল না। তাহার পরে আরও দুই- এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেঘদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি দ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধহয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধহয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গগুলি পূর্বদিক হইতে উঠিয়াছিল, কোনো কোনোটি পূর্বদিক হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্ধপাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কালো পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ করি নাই, লক্ষ করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত

সময় আমার একটা নেমকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামতো তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চিৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চিৎকার অত্যাশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চিৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমতো হ্রস্ব- দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চিৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ- নিচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোনো একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়। সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কনডকটার (conductor); যে পর্যন্ত ননকনডকটরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার ওপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধহয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কাল যাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার

অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি। এক্ষণে সে- সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই- একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো- পথ দিয়া আমার পালকি চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়প্বার্শস্থ লতা- পল্লব পালকি স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ 'শাল তাল তমাল, হিন্তাল' শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই; কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশীয় কদম্ববৃক্ষের মতো, নাহয় কিছু বড়; কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পালকির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি শুষ্ক প্রান্তর দেখা গেল, এখানে- সেখানে দুই- একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে- প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে- প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি

কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনো দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক- একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানত কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! যে- সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা- বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ- বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরইও পর্ণকুটির। আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরশি ঝুলিতেছে, কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল,

কিন্তু দেখিল কেবল পালকি আর বেহারা। পালকির ভিতরে কে বা কী, তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি, পল্লিগ্রামে বালক- বালিকারা প্রায় পালকি আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে 'বরকনে' দেখিবার নিমিত্ত পালকির ভিতরে দৃষ্টিপাত করে। যিনি পালকি চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্য বালক- বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দয়।

তাহার পর আবার কতদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে-যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধহয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে- সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার-ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখনো স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ-কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্বে কয়েকবার কেবল যুবতীদের কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথঘাটে বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়,

কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনো কখনো চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে। লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধহয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মানুষের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগনায় পর্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্য জাতির সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্য জাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বকালে যখন আর্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্যগণের গোরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্যেরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখনো কখনো দলবল জুটাইয়া লাঠালাঠিও করিতেন।

শেষে বহুকাল পরে যখন আর্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন, তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভালো ভালো স্থান আর্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে। অদ্যাবধি সেই পাহাড় পর্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বলবীর্য নাই; আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ- পাঁচ জন এখানে-সেখানে বাস করে, আর কিছুদিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পরাজিত জাতিরা বিজয়ী কর্তৃক বিতারিত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্বস্থানে যে সকল সুবিধা ছিল, তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ- কথা অনেক স্থলে সত্য, সন্দেহ নাই; অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধহয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও একসময় আর্যগণ কর্তৃক বিতারিত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেককাল তথায় বাস করে, অদ্যপি তথায় খাস সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্বাপেক্ষা তাহাদের- যে কুলক্ষয় হইয়াছে এমত শুনা যায় না।

মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবরা গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইন্ডিয়ান, নাটিক ইন্ডিয়ান, নিউজিলান্ডার, তাস্মানীয় প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরি নামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, কর্মঠ বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ

পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, বিশ বৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কী তাহা জানি না। বোধহয় এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে, অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন:

> 'He is the noblest of savages, not equalled by the best of Red Indians.'

তথাপি এ- জাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে সাহেবদের অত্যাচারে? তাহা কদাচ নহে। ক্যানেডার অধিবাসী সম্বন্ধে সাহেবরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিকি লিখিয়াছেন যে:

> "In Canada for the last fifty years the Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops **** The Government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes, paid their medical attendants****but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would."

সমাজোপযোগী ভালো স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে তো এই জাতিদের যাইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুললোপ হইলো কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও

অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ- কথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের তো কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না। আমরা এ- কথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষে আদিম জাতির কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোনো জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে, এমত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ আর- এক সময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ- সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শীবের গীত বোধ হইবে। কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয় তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভালো লাগিবে না, এ- কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক, আগামীবারে সতর্ক হইব। কিন্তু যে- কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল, তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কথা কিছু বলি। কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালীর উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে; বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালী সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর আর ভাবনা কী? এ সকল তো বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গ সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কি একবার অনুসন্ধান করিলে ভালো হয় না? শুনিতেছি, গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভালো!

তৃতীয় প্রবন্ধ

পূর্বে একবার 'লাতেহার' নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন- চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধহয় তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন এমন উমেদ রাখেন, *বঙ্গদর্শনে* আমার লিখিত পালামৌ পর্যটন পড়িয়াছেন; আবার ভালো বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত; তুমি প্রশংসা কর আর না-কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমার পুরাতন কথা শুনিবে; তুমি শুন বা না-শুন সে তোমায় কথা শুনাবে। পুরাতন কথা এইরূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহারো পুঁজি বাড়িবে না, কেননা আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চিরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখনো ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই, কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোনো গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমাকে সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে

অভাগিনী। সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধহয়, আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম। এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করিয়া বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটিকে আমি বড় ভালোবাসিতাম, তাহার নাম 'কুমারী' রাখিয়াছিলাম। তখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া 'দুনিয়া' দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ- সাত ক্রোশ পর্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই- একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোনো গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্নভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী, জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কী ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম এই আমার 'দুনিয়া' ।

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার উপর দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি- পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা গোপন করিতে

পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল; একটি কালো কালো বড় গোছের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক- একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম, এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল:

'রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্।'

আমি পশ্চাতে ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারিদিক চাহিলাম কোথায়ও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি, এমত সময় আর- একদিকে শব্দিত হইল:

'রাধে মন্যুং' ইত্যাদি।

আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে, কতক কৌতূহলপরবশে গেলাম। সেদিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কিয়ৎ পরেই 'কুমারী'র ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্বমতো বোধ হইল না। কেবল সুর আর ছন্দ শুনা গেল। 'কুমারী'র মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটি পক্ষী আর একটির নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখনো কখনো অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের একটি মাত্র শ্লোক

জানিতাম; ছন্দটি উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য হইয়াছিল; আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম 'রাধে মন্যুং!' কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই, কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল।

তাহা যাহাই হউক আমি অবাক হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যিনি 'উদ্ধারদূত' লিখিয়াছেন, তিনি হয়তো এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন। শ্লোকটির সঙ্গে এই 'কুঞ্জকীরানু- বাদে'র বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটি এই:

রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম,

জাতং দৈবাদসমৃশমিদং বারমেকং ক্ষমস্ব॥

এতানাকর্ণয়সি নয়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদান,

এভিঃ ক্রুরৈর্বয়মবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃ স্মঃ॥

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময়ে কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষ শাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে, কুঞ্জপক্ষীরা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল অর্থ না- বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুনলে-

কুঞ্জের ঐ পাখি কী বলিল—শুনলে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ, পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল, "রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম, "। তাহাই বলিতেছিলাম বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু ছন্দ- যে কোনো পক্ষীর স্বরে স্বাভাবিক আছে তাহা আমি জানিতাম না। সুতরাং বন্যপক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটির সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটি রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, জৈবিক কারণে পূর্বপুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিয়াছে। বৈষ্ণবদের উচিত এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে একটি হরিয়াল পালন করি, দেখি সে রাধে মন্যুং পরিহর' বলে কি না বলে।

আর একদিনের কথা বলি; তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যেরূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে

দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কী অনুভব করিব। এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ- সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জল গ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট পেন্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ- কথা না বলিলে ভালো দেখায় না, বিশেষত অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরনে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে চলিলাম। আমি স্বভাবত বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র- ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখনো ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারিরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনো গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনো আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান

বদনে রণক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে এ- কথা তাহাদের মনে আইসে না। যতদিন তাহাদের মনে এ–কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয়নাই। বাঙ্গালীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভালো হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতক দূর গেলে সে আমায় বলিল, "বাঘটি আমি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোনো কথা না বলিয়া চলিল। তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালোবাসার সঞ্চার হইল। 'স্বহস্তে মারিব' এ কথায় বুঝিয়াছিল, যে পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ- কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, তাহাতেই কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষèতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "আপনি জুতা খুলুন, শব্দ

হইতেছে।” আমি জুতা খুলিয়া খালিপায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতক দূর গিয়া বলিল, “আপনি এইখানে দাঁড়ান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।” আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল- বদনে বলিল, “হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন বাঘ নিন্দ্রা যাইতেছে।” আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের একস্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর- নির্মিত একটি কুটির, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর- সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধহয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যেদিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেইদিকে চলিল। আমায় বলিল, “মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।” তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, “আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।” উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল। শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙিল না। পরদিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটি আমার তাঁবু পর্যন্ত

আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোনোপ্রকার আলাপ হইল না।

চতুর্থ প্রবন্ধ

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি; কিন্তু ভাবিতেছি এবার কী লিখি? লিখিবার বিষয় এখন তো কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু- না- কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় তো আর ভালো লাগে না; পাহাড়- জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কী? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তি তথায় বাস করে, তাহারা জঙ্গলী, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই— এ- কথা বলিলে লোকে আমায় কী বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক। একদিন সন্ধ্যার পর চিকপরদা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবি ঢঙ্গে কুক্কুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় একজন কে আসিয়া বাহির হইতে আমায় ডাকিল, "খাঁ সাহেব!" আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ, নং এক এই যে, আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাঁহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতিপ্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে 'শুনুন' বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ, নং দুই যে, আমাকে 'খাঁ সাহেব' বলিয়াছে। বরং 'খাঁ বাহাদুর' বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম; ভাবিতাম, হয়তো লোকটা আমাকে মুছলমান বিবেচনা করিয়াছে কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। 'খাঁ সাহেব' অর্থে যাহাই হউক ব্যবহারে তাহা আমাদের 'বোস মশায়' বা 'দাস মশায়' অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানি যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসি দেশে যাহার জুতা সেলাই হয়, তাহাকে 'বোস মহাশয়' বা 'দাস মহাশয়' বলিলে সহ্য হইবে কেন? 'বাবু মহাশয়' বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু 'হারামজাদ' 'বদজাত' প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরি। বোধহয় সে রাত্রে বড় শীত পড়িয়াছিল, তাই তাঁবুর বাহিরে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোনো উত্তর করিল না; বোধহয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে; তাহা কিছুই না- করায় আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি চমৎকার লোক। সেও হয়তো আমাকে ভাবিল, 'চমৎকার লোক'। নাম জানে না, পদ জানে না, কী বলিয়া ডাকিবে তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া 'খাঁ সাহেব' ডাকিয়াছে,

তাহার উত্তরে যে ‘হারামজাদ’ বলিয়া গালি দেয় তাহাকে ‘চমৎকার লোক’ ব্যতীত আর কী মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার ‘খানশামা বাবু’ তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডুয়নশব্দ দ্বারা আপনার আগমন- বার্তা জানাইল। আমার তখনো রাগ আছে, ‘খানশামা বাবু’ও তাহা জানিত, এইজন্য কলিকা হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল; কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় ‘ফুঁ’ দিতে লাগিল। আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে—এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কী নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সেদিকে কিছুই নাই, কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; তাহার পরেই দেখি দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম।, একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধহয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি ঊর্ধ্বে নীল আকাশে কোনো বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমেষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ি এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল; গেঙ্গোখালি ‘মোহনা’য় যেখানে ইংরেজরা

প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সইখানে একদিন অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম। তথায় কোনো বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ন ভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম 'জঙ্গলী পাখি হয়তো কখনো মানুষ দেখে নাই, দেখিলে বিশ্বাসঘাতককে চিনিত'। চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমেষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম; তাহার কী আশ্চর্য রূপ। সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক তাহাই দেখিলাম। আমি কখনো কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মতো রূপ দেখিয়া থাকি, এইজন্য আমি যাহা দেখি তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কী জিনিস, রূপের আকার কী, শরীরের কোন্, কোন্ স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এইজন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশত আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখনো অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাশ করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারো দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহলাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কী বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভুত- প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহে আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেইপ্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষত মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোনো প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাঁহারা বলেন যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি, এমত সময় আমার 'খানশামা বাবু' বলিল, "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল।" শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্বমতো গর্জিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম।

সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পর দিবস অপরাহ্নে দেখি, এক বটতলায় ছোট বড় কতকগুলো স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই- একটা 'বেতো' ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাহারাও 'বাই', ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাইতেছে। এইসময় পূর্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, অতি প্রত্যুষে সে চলিয়া গিয়াছে। আমি

আর কোনো কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজপুত্র প্রতিবাসী বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, 'খরচাও ফুরাইয়াছে।দুইদিন উপবাস করিয়াছে, আরো কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কী যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকাডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই- পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোনো ক্ষতি হইত না; অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এরূপ কথা আমার সর্বদা মনে হইত।

দুই- চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি দশ ক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকটির কথা

শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথে মরিয়াছে।" এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড় কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া 'খাঁ সাহেব' কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা 'দাড়ি' হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্যলোকেরা এক- এক স্থানে পাতকুয়ার ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাদে জল ক্রমে ক্রমে চুঁইয়া জমে। আট- দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে 'দাড়ি' বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্বাপেক্ষ বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?" আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা 'খোপা' বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই- তিনখানি কাঠের 'চিরুনি' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহবা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই, বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানাভঙ্গিতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়- মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে। তাহারা বসিয়া নানাভঙ্গিতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ- বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য- উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো; সকলেরই অনাবৃত দেহ, সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরশির ধুকধুকি চন্দ্রকিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহলাদে পরিপূর্ণ,

আহলাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়- মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুকধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে 'ধুয়া' ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন সুর কখনো পাহাড়ের মূল পর্যন্ত, কখনো বা পাহাড়ের বক্ষ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে; তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেইসঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি- একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে, দুই- তিন

স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরও কালো দেখাইতেছে; তাহারা তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি। নৃত্যের শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত; অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

পঞ্চম প্রবন্ধ

কোলের নৃত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধহয় যেন উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতকদূর গিয়াছিলাম। বরকর্তা আমার পালকি লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না, ভাবিলাম না করুক, আমি রবাহুত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পালকি বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ- বারোজন পুরুষ আর পাঁচ- ছয়জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম; কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না; তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতক দূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ করিল না; হয়তো দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম মুছিতে লাগিলাম, আর রাগভরে পাথুরে মেয়েগুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আরো কত কী বলিলাম।

আর একবার বহু পূর্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগান 'লসিংটন লজ' হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না; সুতরাং এখনকার মতো বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেশন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক্‌টক্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গবর্নর জেনেরল কাউনসলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয়তো যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেইজন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মতো আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন, যেন সেইসঙ্গে একটু 'দুয়ো' দিয়া গেলেন—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোশামুদেরা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে—কলাগাছে ঝড়, আর শিমুলগাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন থাক; যে হারে সেই রাগে। কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাঙ কি, কী

তাহা স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্য হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে, কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহবা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয়তো থাকিতে না- পারিয়া শেষে ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহবা গালি পর্যন্ত দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ করে। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতিরাত্রে কুমার- কুমারীর বাকচাতুরী হইতে থাকে, শেষ তাহাদের মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটি ঠিক নহে। কোলেরা প্রেমপ্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক। নৃত্য হাস্য- উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কানাকানি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে, কুমারীর আত্মীয়- বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর- ধনুক সংগ্রহ করে, অস্ত্রশস্ত্রে শান দেয়। আর অনবরত কুমারের আত্মীয়- বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চিৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয়পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী হাসি- হাসি মুখে বেশ বিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারিপার্শ্বে দাঁড়ায়। হয়তো ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়। বেশ বিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মতো নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথায় গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই- একটি ডাল দুলিয়া উঠিল। তাহার পর এক নবযুবা, সখা সুবলের মতো লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো দুটা- চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে করিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চিৎকার করিতে বাধ্য। চিৎকারও সে করিতে লাগিল, হাত–পাও আছড়াইল এবং চড়টা চাপড়টাও যুবাকে মারিল; নতুবা ভালো দেখায় না! কমারীর চিৎকারে তাহার আত্মীয়েরা ‘মার মার’ রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে- সেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহারাও বাহির হইয়া পথ রোধ করিল। শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মতো, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই- একবার নাকি সত্যসত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা- হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোনো মন্ত্রতন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। একসময় পৃথিবীর সর্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশে স্ত্রী- আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাউটিবেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে- সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্তান অঞ্চলের বর- কন্যার মাসি- পিসি একত্র জুটিয়া নানাভঙ্গিতে নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বর- কন্যা গির্জা হইতে গাড়িতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয় তাহাও এই পূর্বপ্রথার অন্তর্গত।[1]

কোলদের উৎসব সর্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখনো কখনো পনেরো টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথায় পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোনো উপার্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ করিতে হয়। দুই- চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্তানি মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ দেয়। এই হিন্দুস্তানিরা মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ করিল সে সেইদিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জন করিবে তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস, কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে, মহাজনের গৃহে তাহা আনিতে হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কী করিবেন, শেষ হিসাব

---

[১]যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম তাহা Exogamy নহে। কেন না, ইহা স্বজাতি-বিবাহ।

করিয়া বলিবেন যে আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কী? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল, মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাতক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকি কর্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাতক জন্মের মতো মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জন করিবে তাহা মহাজনের! মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এ- ই উপলক্ষে 'সামকনামা' লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল সে রীতিমতো গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম বিনা বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোনো সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না-পলাইল সে জন্মের মতো মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দশা পুত্রের

বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন আমি বড় লোক, আমি 'ধুমধাম' না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার পর যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায় 'আমি ধনবান্' বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কী বলেন জানি না। কিন্তু বোধহয় হিন্দুস্তানি মজাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্বমতো সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধহয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে- অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্তানি সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবত যে- অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিমাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভালো হয় না। আমাদের

বাঙ্গালায় এ- কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একসময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণদানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্তানি মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নবনধূ আমি কখনো দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভালখাকীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর এক রাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্বমতো দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। এক রাত্রে তার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোটভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ঘীরে এক নির্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত শামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। শামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। শামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে- সেখানে পূর্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলবর! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধুর সেইদিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন

ভাণ্ডে আহার খুঁজিতেছে, নববধূর চোখে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্বমতো দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর- ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা?" নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয়তো বলিত, "এই কুক্কুরী সংসারী।"

পূর্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর; কখনো কাহাকেও তো জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হলে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! আমি বলি বুঝি কার জন্য রেখেছ?" নববধূ হয়তো মনে করিল পূর্বে আমায় 'ওই' বলিতে, আজ কেন তবে আমায় 'তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্তন

অতি আশ্চর্য! একরাত্রের পরিবর্তন বলিয়া আশ্চর্য! নববধূর মুখশ্রী একেবারে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষরাত্রের পদ্ম। বালিকা কী বুঝিল, যে মনের এই পরিবর্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল!

ষষ্ঠ প্রবন্ধ

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। একসময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেইখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভালো লাগে না, তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, "তা কেমন করিয়া হবে, এখনো যে এ- গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ 'পালামৌ' পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব যে, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।"

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধু ভাষায় বুঝি ইহাকে মধুদ্রুম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধু ভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এইজন্য এক- একবার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এইজন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই- যে

এইমাত্র মধুদ্রুম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে আশোকবৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই, তাঁহারা হয়তো কিছুই বুঝিবেন না; সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন; এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ- কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন—সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুস্তানিদের কেহ কেহ শখ করিয়া চালভাজার সঙ্গে এই ফুল খাইয়া থাকে। শুকাইয়া রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দুই- তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল শেফালিকার মতো ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে, বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি, মৌমাছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পূরিয়া যায়। বোধহয় দূরে কোথাও একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নাবৎ কী একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি, তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সেদিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোনো একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোনো একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে

হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে—অথচ কীজন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে, যাঁহাদের পূর্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লিগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেইসঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফূট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুনগুন শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভালো লাগিত কিনা স্মরণ নাই, এখনো ভালো লাগে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা- পল্লবশোভিত সেই পল্লিগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গীগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভালো লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভালো লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য তাহা আর জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য, বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর পূর্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয়তো আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেইজন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ।

নিত্যমুহূর্তে এক- একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালোবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়; কিন্তু যে- পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধহয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোন্ পটের বন্ধনী কী, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনিই কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতাশক্তি কত দূর জানি না, কিন্তু বোধহয়, সে বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেননা আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল, বিস্তর বমি করিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতি মদের সহিত তুলনায় এ

মদের দোষ কী, তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতি মদে নেশা আর লিবর দুই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটি থাকে, নেশা- লিবর থাকে না; তাহাতেই এ মদের এত নিন্দা, এ মদ এত শস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশী মদের আর একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত পা দুইয়ের একটিও ভালো চলে না। কিন্তু বিলাতি মদে পা চলুক বা না- চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজকাল আমাদের দেশেরও দুই- চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার স্বপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রান্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদের দেশী জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তরজ্বালা নিবারণ হয়।